নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখো... গল্প জেতো ২০০৫

ক বিভাগ ষষ্ঠ

স্বপ্ন যদি সত্যি হত

লিংকন মজুমদার

আমি লিংকন। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। টিভিতে আলিফ লায়লা দেখে ঘুমুতে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে যদি খানদানি জিনের একদিন দেখা পেতাম তবে তার কাছে কত কিছু চেয়ে নিতাম। যেমন একটা উড়ন্ত মাদুর আর এক হাঁড়ি দই। মাদুরে উঠে দই নিয়ে মামা বাড়ি যেতাম। আর সবাইকে দই খেতে দিতাম। যত লোক আসতো সবাইকে দিতাম দই খেতে কিন্তু ঝাগড়াটে দাদুকে দইয়ের সঙ্গে ঝাল মিশিয়ে দিতাম। দাদুর ঝাল লাগলে বলতাম দাদু যারা ঝগড়া করে তাদের এই দই খেলে ঝাল লাগে। অতএব বুঝে দেখ ঝগড়া করা ভালো কিনা মন্দ। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেছি। স্বপ্ন দেখছি মাকে নিয়ে মামা বাড়ি যাচ্ছি। খুলনা থেকে ট্রেনে উঠলাম মা আর আমি। সঙ্গে কেউ নেই। ট্রেন লেটে ছাড়ল। পথে রাত হল, মা ভয় পেলেন। আমি বললাম ভয় করো না মা আমি আছি না। এমন সময় দেখি আমাদের রুমের ভিতরে একটা সিটে বসে আসেন একজন লোক। তার শরীর থেকে আলো বেড়োচ্ছে। মা ভয় পেয়ে গেলেন। আমি তাকিয়ে দেখি সত্যিকারের সেই খাদদানি জিন। আমি বললাম মা ওনাকে ভয় পাচ্ছ কেন? ওনাকে আমি চিনি। ওনার সঙ্গে আমার কত দেখা হয়েছে। তুমিতো টিভি দেখ না তাই ওনাকে চেন না। উনি খানদানি জিন। মানুষের উপকার করে, ক্ষতি করে না। জিন সাহেব আমার কথা শুনে খুব খুশি হলেন। আমাকে তার পাশে বসালেন এবং গল্প বলতে লাগলেন। বললেন লিংকন পৃথিবীর সব মানুষ যদি তোমাদের মতো সরল হত তবে পৃথিবীতে সুখ থাকত। দুঃখ থাকত না। আজ দুনিয়ার সবখানে মারামারি, বোমা হামলা, যুদ্ধ লেগেই আছে। আর মারা যাচ্ছে মানুষ। শিশুরাও বাদ যাচ্ছে না। আমি বললাম হ্যাঁ জিন সাহেব আপনি আমাকে এমন একটা অস্ত্র দিতে পারেন যা দিয়ে যারা অন্যায় করবে, আমাদের মতো শিশুদের, আমাদের মা বাবা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনদের, নিরীহ মানুষদের হত্যা করবে আমি তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখব। ওরা আর জাগতেও পারবে না আর মানুষও মারতে পারবে না। তবে আবারও যদি কখনও জাগে তবে ঘুমে ওদের মন ভালো হয়ে যাবে। যদি না হয় আবার ঘুম পাড়াবো। আমি বৃদ্ধ হয়ে মরে যাওয়ার আগে আমার নাতিকে অস্ত্রটা দিব। সে দেবে তার নাতিকে। এমনি করে পৃথিবীতে আর যুদ্ধ থাকবে না। আমরা শিশুরা শুধু হাসব, গান গাইব, ক্রিকেট খেলব, মামা বাড়ি যাব। মামির তৈরি পিঠা খাব, মামার হাত ধরে বাজারে যাব, বেলুন কেনব, বল কিনব, আইসক্রিম খাব কি মজা হবে জিন সাহেব বললেন ঠিক আছে লিংকন তুমি বস আমি আসি। জিন সাহেব চলে গেলেন। আমারও ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার মায়ের কাছে শুয়ে আছি। প্রতিদিন ভাবি সত্যি একদিন জিন সাহেব আসবেন কিন্তু আসে না। দেখাও করে না। নিডো কাকা জিন সাহেব কি তাহলে আসবে না? মানুষ কি এমনি করে মরতে থাকবে?

লেখক পরিচিতি
পিতা : নিরঞ্জন বিশ্বাস
মসিয়া আদর্শ রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়
শ্রেণী : তৃতীয়
খালিশাখালী, পোঃ মখিয়া, জেলা বাগেরহাট

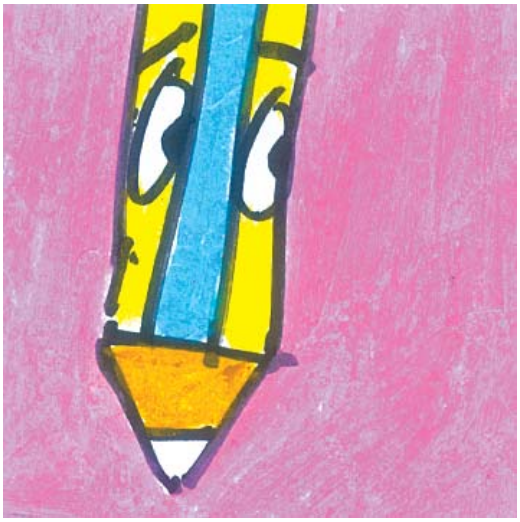

আমি একটি পেন্সিল

সামাহা হামিদ

মানুষের বাচ্চারা মায়ের পেট থেকে জন্ম নেয়, কিন্তু আমার জন্ম হয়েছে কারখানায়। জন্মের সাথে সাথে আমাকে একটি বন্ধ প্যাকেটের ভিতরে রেখে দেয়া হয়। আমি অনেক দিন বন্ধ প্যাকেটের ভিতরে পড়ে ছিলাম। একদিন একটি ছোট্ট মেয়ে আমাকে বের করল। সে দিন আমি প্রথম বাইরের জগৎ দেখেছিলাম। ছোট মেয়েটি আমাকে স্কুলে নিয়ে যেতো। সেই সময় তার বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল। পড়াশোনায় সে খুব ভালো ছিল। আমাকে দিয়ে সে খুব দ্রুত লিখতো। মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড ব্যথা করতো। কিন্তু মেয়েটি থামতো না। আমার শিস ভোঁতা হয়ে গেলে মেয়েটি শার্পনার দিয়ে আমাকে ধার করতো। ধার করার সময় আমার বেশ কাতুকুতু লাগতো। এভাবে লিখতে লিখতে আর ধার করতে করতে ছোট মেয়েটি আমাকে অনেক ছোট করে ফেললো। একদিন আমি সবার অজান্তে গড়িয়ে গড়িয়ে টেবিল থেকে নিচে ঘরের কোনায় পড়ে গেলাম। ভেবেছিলাম আর কেউ না খুঁজুক, অন্তত ছোট মেয়েটি আমাকে ঠিকই খুঁজবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেউ আমার খোঁজ করলো না। আমি ঘরের কোনায় শুয়ে শুয়ে সবার কথা শুনতে পাই। কে কি করছে আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারি। ছোট মেয়েটির প্রত্যেকটি কথা আর নড়াচড়ার আওয়াজ আমার কানে আসে। আমি বুঝে গেছি আমার প্রতি তার আর আগ্রহ নেই। সে এখন আমার বোনকে দিয়ে লেখালেখি করছে। আমি এখনও অপেক্ষা করছি ঘরের কোনায় অন্ধকারে। বাসার ঝাড়ু দেয় যে কাজের মেয়েটি, সে খুব ফাঁকিবাজ। একদিনও কোনাটা ঠিকমত ঝাড়ু দেয় না। জানি না কোনো দিন এখান থেকে বের হতে পারব কি না! মাঝে মাঝে পিঁপড়া আর তেলাপোকা কামড় দিয়ে বেশ বিরক্ত করছে। ভাগ্যিস বাসার মধ্যে ইঁদুর ছিল না, তা না হলে কবেই আমাকে মেরে ফেলতো। তবে এখন মনে হচ্ছে, ইঁদুর থাকলেই ভালো হতো। এ রকম অন্ধকারে একাকী জীবন থেকে মৃত্যু অনেক ভালো। হে মানুষ জাতি! তোমরা কখনো পেন্সিলকে এ রকম কষ্ট দিও না। তোমাদের যেমন কষ্ট আছে, পেন্সিলদেরও কষ্ট আছে।

লেখক পরিচিতি
মোঃ শাহজাহান হামিদ ববি
স্কলাস্টিকা, তৃতীয় শ্রেণী
বাড়ি নং-৫১, সড়ক নং-২, (চতুর্থ তলা)
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা

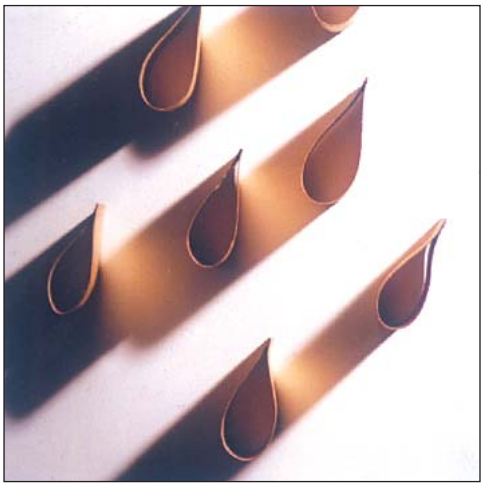

বৃষ্টিতে ভেজা

নিশাত নিগার নিশি

ঐ যে, রান্না ঘর থেকে আম্মু ডাকছে। নিশু হাতের লেখাটা শেষ করে নাও। আম্মুটা যে কি যখন তখন শুধু পড়া, পড়া আর পড়া। এই তো সবেমাত্র টিচার গেল। আম্মুর পড়া, স্কুলের পড়া, টিচারের পড়া, গানের টিচার, হুজুর এত কিছু করতে হাঁপিয়ে উঠি। এত ভালো লাগে না। কিন্তু যখন আবার রেজাল্ট বের হয় তখন রেজাল্ট খারাপ হলে মন খারাপ লাগে। মনে হয় আমি কেন প্রথম হতে পারি না।

ইস্ আমার কাছে যদি একটা যাদুর পেন্সিল থাকত তাহলে কতই না মজা হতো। যা চাইতাম তাই পেতাম, আম্মুর আর বকা খেতে হত না। কতই না মজা হতো।

ভাবতে ভাবতেই স্কুলের সময় হয়ে গেল। স্কুলে চলে গেলাম। স্কুলে পৌঁছাতেই মেঘের গুড়ুম গুড়ুম ডাক শুরু হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম বৃষ্টি হবে। আনন্দে মনটা ভরে উঠল কারণ বৃষ্টি আমার খুব প্রিয়। প্রিয় হলে কি হবে আম্মুটাতো খুব পচা। বৃষ্টি দেখলেই বলবে ভিতরে যাও কারণ আমার আবার খুব ঠান্ডা লাগার অসুখ আছে। তার উপর গানের গলা। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে এলো। স্কুলেও ছুটির বেল পড়ল। আমার মনটা আজ নেচে উঠল। আজ আমি ভিজবই কি মজা আম্মুও জানতে পারবে না।

আম্মুটা যে কেন বোঝে না মজা করতে কত ভালো লাগে আর তা যদি হয় বৃষ্টিতে ভেজা। নানু বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। পুকুরের মাছ ধরা, কদম গাছের কদম ফুল, আমাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। আম্মুর কথা ভুলে গিয়ে আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নানুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছালাম। বৃষ্টিতে ভিজে গল্প করতে করতে নানুর বাড়ি যেতে কতই না মজা লাগল।

নানু তো আমাকে একা দেখে অবাক। আবার খুশিও হল। কিন্তু আম্মুর কথা ভেবে আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম। তবে নানুর ভরসায় সাহস পাচ্ছিলাম। পরে নানু আম্মুকে ফোন করে চিন্তা করতে মানা করেছিল যে নিশু আমাদের এখানে আছে। বৃষ্টিতে ভেজার কথাটা নানু চেপে গিয়েছিল।

পরে আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম আমার গা-টা গরম হয়ে আসছে। সারা শরীর কাঁপুনি দিচ্ছে। তারপর আমার আর হুস ছিল না। পরে নানুর কাছে জানালাম সব ঘটনা। এত জ্বর উঠেছিল আমার যে বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের লাইন লেগে গিয়েছিল আর আম্মুর সে কি কান্না। আমার আম্মু আমি একটাই মেয়ে। আমার আম্মু আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু আল্লাহ্‌কে ডেকেছিল। সে যাত্রা আল্লাহ আর আম্মুর দোয়ায় আমি বেঁচে উঠেছি।

পরে বুঝতে পারলাম, আম্মুকে মিথ্যা বলার ফলে আমি এটা পেলাম। আমিও ভুগলাম আম্মুকেও ভুগালাম। সেই থেকে কান ধরেছি আর কোনদিন কখনও মিথ্যা বলব না। আম্মু যা বলবে তাই শুনব। আম্মুর বাধ্য মেয়ে হয়ে চলব। তবেই জীবন হবে সুন্দর।

লেখক পরিচিতি
পিতা : মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
পাবনা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শ্রেণী : ৪র্থ শ্রেণী
ইলোরা পাথরতলা, পাবনা

বুদ্ধিমান বালক

মোমেনা ইসলাম

এক সময় বাংলাদেশের একটি গ্রামে এক বুদ্ধিমান বালক বাস করতো। তার নাম ছিল ফরহাদ। সে তার গ্রামের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতো। সে যে পথ দিয়ে বিদ্যালয়ে যেত সে পথে একটা খাল ছিল। খালের ওপর ছিল বহু দিনের পুরানো একটা কাঠের সেতু। গ্রামের লোকদের চলাচলের জন্য এটা ছিল খুবই দরকারি। কিন্তু সেতুটি এতোই পুরানো এবং দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, এর ওপর দিয়ে চলাচল করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তবু কেউ এর মেরামতের জন্য কোনো রকম যত্ন নিত না। তাই অযত্নে-অবহেলায় সেতুটি একদিন ভেঙে পড়ে গেল খালের পানিতে।

এতে ফরহাদের খুবই অসুবিধা হলো। খাল পার হয়ে সে বিদ্যালয়ে যেতে পারল না। গাঁয়ের লোকদের দুই পারের যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ফরহাদ ভাবতে লাগল, 'সেতুটা মেরামত করা দরকার। তাহলে গাঁয়ের লোকেরা খাল পার হয়ে বাজারে যেতে সমর্থ হবে।'

কিন্তু ফরহাদের বাবার তেমন অর্থকড়ি ছিল না। তাই সেতুটি মেরামত করার মতো টাকা ছিল না তার কাছে। তবু সে হাল ছেড়ে দেয়নি। সারাক্ষণ ভাবতে লাগল, কীভাবে সেতুটা মেরামত করা যায়।

একদিন ফরহাদ একটি বড় মৌচাক দেখল। পুকুরের পাশে একটি গাছের শাখায় এটা ঝুলছিল। অনেকগুলো মৌমাছি বাস করছিল তাতে। মৌমাছিগুলো সবই ছিল আকারে ছোট কিন্তু তারা সবাই একসাথে কাজ করছিল। মৌমাছিদের কাজ করা দেখে ফরহাদ অনুপ্রাণিত হলো। একটি ভালো ধারণা হলো তার। সে ভাবল, 'গ্রামবাসীরা প্রায় সবাই গরিব। তাই তারা সহজেই সেতটু মেরামত করতে পারে না। এজন্য তাদের সকলের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

ফরহাদ তার ধারণাটা গাঁয়ের লোকদের বুঝিয়ে বলল। সে যা বলল, গাঁয়ের লোকেরা তা বুঝলো। অবশেষে সবাই এগিয়ে এলো সেতুটা মেরামত করার জন্যে। সেতু মেরামতের কাজ শুরু হয়ে গেল। উৎসাহের সাথে গ্রামবাসীরা সকলেই কাজ শুরু করল। কেউ কেউ টাকা দিল। কেউ কেউ কাঠ সরবরাহ করল। কেউ কেউ শ্রম দিল। এভাবে সকলেই একটা না একটা কিছু করল। তাতে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সেতুটি মেরামত হয়ে গেল।

ফরহাদ খুব আনন্দিত হলো। বন্ধুদের নিয়ে সে বিদ্যালয়ে গেল। খালের অপর পারের সাথে যোগাযোগ শুরু হলো, গ্রামবাসীরা বাজারে গেল সেতু পার হয়ে। গাঁয়ের সবাই এখন বলে, "ফরহাদ খুবই বুদ্ধিমান বালক।" সবার মনেই এখন একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সকলে মিলে কাজ করলে যে কোনো কঠিন কাজও সহজ হয় যায়।

লেখক পরিচিতি
পিতা : মো: মমিনুজ্জামান
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
তৃতীয় শ্রেণী, বাসা নং-১৪৯/এ, রোড নং-২
মোহাম্মপুর

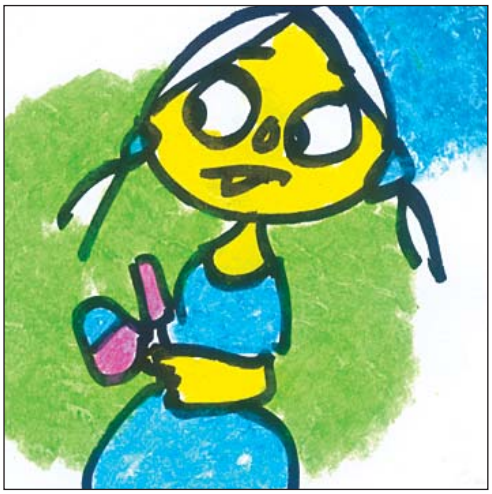

আইসক্রিম

রুবনা বেগম

আমার স্কুলে যেতে খুব ভালোলাগে। আমি প্রতিদিন স্কুলে যাই। মা আমাকে টিফিনের জন্য চার পাঁচ টাকা দেন। মা আমাকে যে টাকা দেন আমি আমার সব বন্ধুদের নিয়ে সে টাকায় টিফিন খাই। আজ আমি দুইটি আইসক্রিম কিনলাম। আইসক্রিম আমার খুব প্রিয় খাবার।

আমার স্কুলটি দোতলা। সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরের ক্লাসে যাই। গিয়ে দেখি যে কেউ আসেনি। আমি একটু নার্ভাস হয়ে যাই। ভাবছি আজ এতো সকালে এসেছি যে কেউ আসেনি। আমি একটু অন্যমনস্কভাবে দুইটি আইসক্রিম খুললাম। কাগজ খুলেই দেখি একটি আইসক্রিম শুটকো ও আরেকটা আইসক্রিম মুটকো। আইসক্রিম দুটো হাতে নিয়ে ভাবছি শটকোটা খাবো না মুটকোটা খাবো। ডান হাতেরটা একটু শুটকো এবং বাম হাতেরটা একটু মুটকো। তাই আমি ভাবছিলাম শুটকোটা খাবো না মুটকোটা খাবো। বলতেই আছি অথচ খাচ্ছি না। স্কুলের জানালায় দুটি ভূত ছিল। একটির নাম শুটকো আরেকটার নাম মুটকো। ভূত দুইটি ছিল ঘুমিয়ে। আমার কথার শব্দে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মুটকো ভূতটা আমার কথা শুনে খুব ভয় পেল। সে শুটকো ভূতটাকে ডেকে বলল শুটকো শুনছিস মিতা কী বলে। শুটকো খাবো না মুটকো খাবো। শুটকো শুনে মাঃ মাঃ বলে কাঁদতে শুরু করে। মুটকো শুটকোর মুখ চেপে ধরে বলে থাম তোকে আর মাঃ মাঃ বলে কাঁদতে হবে না। এখন যে কী হবে। শুটকো বলে পেয়েছি পেয়েছি। মুটকো বলে কী পেয়েছিস। শুটকো বলে চল আমরা মিতার পা ধরে মাফ চেয়ে নেই। মুটকো বলে তাতে কী আর কাজ হবে। শুটকো বলে একবার চেষ্টা করে দেখি না। তারপর শুটকো ও মুটকো মিতার কাছে যায়। গিয়ে মিতার পা ধরে বলে হুজুর আপনি আমাদের মাফ করে দেন। আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন। মিতা খুব ভয় পেল।

মিতা ভয়ে বলল, কে কে তোমরা কে। ভূতেরা বলল আমাদের নাম তো একটু আগে আপনি বলছিলেন। ও তোমরা শুটকো ভূত ও মুটকো ভূত। ভূতেরা আপনি আমাদের খাবেন না হুজুর। ঠিক আছে ঠিক তোমাদের আমি খাবো না। যদি তোমরা আমার বাড়িতে বেশ কয়েকটি গল্পের বই দিয়ে আসো। ভূতেরা কালই পেয়ে যাবেন হুজুর । পরের দিন সকালে ভূতেরা বেশ কয়েকটি গল্পের বই নিয়ে আসে। মিতা তো গল্পের বই পেয়ে খুব খুশি। সে ভূতদের ধন্যবাদ দেয়। বলে তোমরা কী আমার বন্ধু হবে তাহলে প্রতিদিন আমায় বই এনে দেবে। ভূতেরা রাজি হল।

বলল, কেননা তুমি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছিলে। পরে ভূতরা মিতার বন্ধু হয়ে যায়। মিতা প্রতিদিন গল্পের বই পড়ে আর খুব আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। এভাবে খুব সুখে মিতার জীবন চলতে থাকে। এত সুখ আর এতো আনন্দ মিতার জীবনে আর কখনো আসেনি। আর কোন দিন আসবে তাও ভাবেনি। মিতার গল্পের বইগুলোতে খুব মজার মজার গল্প আছে। তার মধ্যে মিতার সবচেয়ে ভালো লাগে ভূতের গল্প। মিতার অনেক গল্পের বই আছে কিন্তু কোনো রূপকথার বই নেই। মিতা একদিন ভূতদের ডেকে বলল তোমরা শুধু আমায় গল্পের বই দাও কোন রূপকথার বই দাও না। ভূতেরা বলল ঠিক আছে আমরা তোমাকে একদিন গল্পের বই ও আরেকদিন রূপকথার বই এনে দেব। মিতা ঠিক আছে। পরে মিতা তার স্কুলের সব বন্ধুদের এই ঘটনা খুলে বলে। তারা বলে এত কিছু হয়ে গেছে অথচ তুই আমাদের কিছুই জানাসনি। মিতা জানাবার সময় পেলাম কোথায়। কালকে বলব রে, আজ আর না, সন্ধ্যা হয়ে আসছে বাড়ি যাই।

লেখক পরিচিতি
রুবনা বেগম
পিতা : আখলিছ আলী
খাসদবীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
ইলাশ কান্দি উদয়ন ২৭, সিলেট